Department of Political Science

Indian Foreign Policy

SEM IV (Hons.)

CC 13

ANIRBAN DAS

Topic: India and the major powers-USA, China, Russia

ভারতের প্রজাতন্ত্র বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল নির্বাচিত গণতন্ত্র। এই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার অত্যন্ত দ্রুত। ২০০৭ সালে ৮.৯ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির কারণে বর্তমানে এটি চীনের পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রধান অর্থব্যবস্থা। ভারতের সামরিক বাহিনী বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম। ক্রয়ক্ষমতা সমতায়ও চতুর্থ বৃহত্তম ভারত এই কারণে একটি আঞ্চলিক শক্তি ও মধ্য শক্তি হিসেবে গণ্য হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এই কারণে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ভারতের কণ্ঠস্বরকে মজবুত করেছে।

১৯৪৭ সালে যুক্তরাজ্যের অধীনতাপাশ থেকে মুক্ত হয়ে ভারত কমনওয়েলথ অফ নেশনস-এ যোগ দেয় এবং ইন্দোনেশীয় জাতীয় বিপ্লব সহ বিভিন্ন উপনিবেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরালো সমর্থন দান করে।ভারত বিভাগ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রীয় বিবাদকে (বিশেষত কাশ্মীর বিবাদ) কেন্দ্র করে পরবর্তী বছরগুলিতে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়েনের সৃষ্টি করে। ঠান্ডা যুদ্ধের সময় ভারত কোনো আন্তর্জাতিক শক্তিজোটকে সমর্থন না করার সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারত ঘণিষ্ঠ সংযোগ গড়ে তোলে এবং উক্ত রাষ্ট্র থেকে বহুবিধ সামরিক সহায়তাও লাভ করে।

ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তি সারা পৃথিবীর মতো ভারতের বিদেশনীতিতেও গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এই সময় ভারত যে সকল আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির সঙ্গে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করার দিকে মনোযোগ দেয়, সেগুলি হল: যুক্তরাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, ইসরায়েল, মেক্সিকো, ও ব্রাজিল । অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ-ইস্ট এশিয়ান নেশনস, আফ্রিকান ইউনিয়ন, আরব লীগ ও ইরানের সঙ্গেও ভারত ঘণিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে।
ভারত রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক বজায় রেখে চললেও ইসরায়েল ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক সহযোগী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও ভারত শক্তিশালী এক রণনীতিসংক্রান্ত সহযোগিতা গড়ে তোলে। ২০০৮ সালে ভারত-মার্কিন অসামরিক চুক্তি সাক্ষরিত ও প্রযুক্ত হয়। এই ঘটনাকে দেখা হয় ভারত-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতির একটি ধাপ হিসেবে।

ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতার সম্পর্কের ইতিহাস বেশ পুরনো। ভারতকে মনে করা উন্নয়নশীল বিশ্বের এক নেতা। ভারত একাধিক আন্তর্জাতিক সংঘের সদস্য, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রসংঘ, জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও জি২০ ইন্ডাস্ট্রিয়াল নেশনস। এছাড়াও যে সব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে, সেগুলি হল ইস্ট এশিয়া সামিট, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, জি৮+৫ ও আইবিএসএ ডায়ালগ ফোরাম । ভারত যেসব আঞ্চলিক সংঘের সদস্য সেগুলি হল সার্ক ও বিম্সটেক। ভারত বিভিন্ন শান্তিপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত অভিযানে অংশগ্রহণ করে এবং ২০০৭ সালে রাষ্ট্রসংঘের দ্বিতীয় বৃহত্তম সেনা সরবরাহকারী রাষ্ট্র ঘোষিত হয়। বর্তমানে ভারত রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ও জি৪ নেশনস-এর স্থায়ী সদস্যপদ লাভের প্রত্যাশী।

বিশ্বের ১৫টি দেশে ভারতীয় পাসপোর্ট এ ভিসা ছাড়াই ভ্রমণ করা যায় । এগুলি হলো : নেপাল, ভূটান, হংকং, মালদ্বীপ, মরিশাস, জর্দান, কম্বোডিয়া, বলিভিয়া, ম্যাকাও, জামাইকা, ফিজি, হাইতি, ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো এবং ডোমিনিকা ।

চীন-ভারত সম্পর্ক

চীন–ভারতের সম্পর্ক,যাকে চীন-ভারত সম্পর্ক বা ভারতীয়-চীনা সম্পর্কও বলা হয়, চীন ও ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে বোঝায়। সময়ের সাথে সম্পর্কের সুরটি বিভিন্ন রকম হয়েছে; উভয় দেশ একে অপরের সাথে অর্থনৈতিক সহযোগিতা চেয়েছে, অন্যদিকে ভারতে মাঝে মধ্যে সীমান্ত বিরোধ এবং অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ বিতর্ক একটি প্রধান বিষয়। আধুনিক সম্পর্কের সূচনা ১৯৫০ সালে যখন ভারত চীন প্রজাতন্ত্রের (তাইওয়ান) সাথে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক শেষ করে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনকে মূল ভূখণ্ড চীনের বৈধ সরকার হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম দেশগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। চীন ও ভারত এশিয়ার দুটি প্রধান আঞ্চলিক শক্তি এবং বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দুটি দেশ এবং দ্রুততম বর্ধমান প্রধান অর্থনীতি। কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির ফলে তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের তাত্পর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। চীন ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রাচীন কাল থেকে এসেছে। সিল্ক রোডটি কেবল ভারত ও চীন মধ্যে একটি প্রধান বাণিজ্যিক পথ হিসাবে কাজ করে নি, তবে ভারত থেকে পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের প্রসারকে সহজতর করার জন্যও কৃতিত্বপ্রাপ্ত। ১৯ শতকে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে চীনের ক্রমবর্ধমান আফিম বাণিজ্য প্রথম এবং দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধের সূত্রপাত করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারত এবং চীন প্রজাতন্ত্রের উভয়ই ইম্পেরিয়াল জাপানের অগ্রগতি থামাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

সমসাময়িক চীন ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক সীমান্ত বিরোধের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে, যার ফলস্বরূপ তিনটি সামরিক দ্বন্দ্ব - ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধ, ১৯৬৭ সালে চোলার ঘটনা এবং ১৯৮৭ সালের চীন-ভারত সংঘাত। ২০১৩ সালের গোড়ার দিকে, বিতর্কিত চীন-ভুটান সীমান্তে ডোকলাম মালভূমিতে দুটি দেশ সংঘর্ষ করেছিল। যাইহোক, ১৯৮০ এর দশকের শেষের দিক থেকে উভয় দেশ কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি সফলভাবে পুনর্নির্মাণ করেছে। ২০০৮ সালে চীন ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার হয়ে ওঠে এবং দু'দেশও তাদের কৌশলগত ও সামরিক সম্পর্ক বাড়িয়ে তুলেছে। বাণিজ্য ও বাণিজ্য ছাড়াও পারস্পরিক আগ্রহের আরও কয়েকটি ক্ষেত্র রয়েছে যার উপর চীন এবং ভারত দেরিতে সহযোগিতা করে আসছে। ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির পণ্ডিত রেজাউল করিম লস্করের কথায়, "বর্তমানে দু'দেশের বাণিজ্য, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক আর্থিক শৃঙ্খলা সংস্কারের মতো আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন স্বার্থ প্রচারের জন্য সহযোগিতা করছে"।

ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্ক সত্ত্বেও, ভারত এবং পিআরসি থেকে উত্তরণের জন্য প্রচুর প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। ভারত চীনের পক্ষে ভারী ভারসাম্যহীনতার মুখোমুখি। দুই দেশ তাদের সীমান্ত বিরোধ সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলি বারবার ভারতীয় ভূখণ্ডে চীনা সামরিক আগ্রাসনের খবর দিয়েছে। উভয় দেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে অবিচ্ছিন্নভাবে সামরিক অবকাঠামো স্থাপন করেছে। অধিকন্তু, পাকিস্তানের সাথে চীনের শক্তিশালী কৌশলগত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক সম্পর্কে ভারত সচেতন রয়েছে যখন চীন বিতর্কিত দক্ষিণ চীন সাগরে ভারতীয় সামরিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

২০১২ সালের জুনে চীন তার অবস্থান জানিয়েছিল যে "চীন-ভারত সম্পর্ক" সবচেয়ে "শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় অংশীদারিত্ব" হতে পারে। সেই মাসে চীনের প্রিমিয়ার ওয়েন জিয়াবাও এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে ১০০ মার্কিন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য স্থির করেছিলেন ২০১৫ সালের মধ্যে বিলিয়ন।

১৯৬২-র পর আবার লাদাখে ভারত-চিন সীমান্ত অগ্নিগর্ভ । গত ১৫ জুন মধ্যরাতে লাদাখ সীমান্তে দু' দেশের সেনা সংঘর্ষ শুরু হয় । সরকারি হিসাবে এখনও পর্যন্ত ২০ জন ভারতীয় সেনার মৃত্যু হয়েছে । এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশজুড়ে চিন বিরোধী স্লোগান উঠেছে । দলমত নির্বিশেষে চিনা পণ্য বয়কটের ডাক দেওয়া হয়েছে । এই পরিস্থিতিতে চিনা সংস্থার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় রেল।

রেলের তরফ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, "পূর্ব কানপুর ও মোগলসরাইয়ের মধ্যে ৪১৭ কিলোমিটার ফ্রেইট করিডরে সিগন্যালিং ও টেলিকমিউনিকেশন কাজের জন্য যে চিনা সংস্থার সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল, তাদের কাজের গতি অত্যন্ত খারাপ। তাই চুক্তি বাতিল করা হল ।" প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে ভারতীয় রেল বেজিং-এর ন্যাশনাল রেলওয়ে রিসার্চ অ্যান্ড ডিজাইন ইনস্টিটিউটকে ৪৭১ কোটি টাকার বরাত দিয়েছিল । এই সংস্থাটি মূলত সিগন্যাল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কাছ করে । চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ছিল ২০১৯ সালে । কিন্তু চুক্তির সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা তো দূরের কথা, রেল খোঁজ নিয়ে দেখেছে ৪ বছরে মাত্র ২০ শতাংশ কাজ হয়েছে ।

শুধু ভারতীয় রেল নয় , চুক্তি বাতিলের পথে হাঁটতে চলেছে ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশনও। চিনা সংস্থা Huawei ও ZTE-এর মতো কোম্পানির সঙ্গে পার্টনারশিপে ভবিষ্যতে ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশন আর কাজ করবে কিনা, তা নিয়েও পর্যালোচনা করে দেখা হবে। এখানেই শেষ নয়, টেলিকম দফতরের তরফে ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা BSNL-কে 4G নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশনে চিনা সরঞ্জাম বর্জন করতে বলা হয়েছে।

ভারত-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক

সাত দশক আগে, ১৯৪৭-এর ১৩ এপ্রিল, ভারতের স্বাধীনতারও আগে রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপন করে ভারত। ২০১৭ সালে দুই দেশের দিপাক্ষিক সম্পর্কের ৭০ তম গৌরবময় বর্ষপূর্তিতে দুই দেশের নাগরিককে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

১৯৪৭-এর পর থেকে ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকা বিশ্বে ভারত ও রাশিয়ার সম্পর্কই কিন্তু অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। সময়ের পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে পাশ করেছে এই সম্পর্ক। ক্ষমতার বৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কও। সমতা, বিশ্বাস ও পারস্পরিক উপকারিতার আদর্শের মাধ্যমে এই সম্পর্ক প্রতিকূল পরিস্থিতিকে জয় করতে পেরেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের পরিবর্তিত বাস্তব ও জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা আমাদের পার্টনারশিপকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি। খারাপ ও ভালো – উভয়ই সময়েই একে অপরের পাশে থেকেছি।

তবে আমাদের সম্পর্ক কিন্তু, বিগত সত্তর বছরের আগে থেকেই ছিল। ইতিহাসের পাতায় যার প্রভাব রয়েছে। সরকারের ঊর্ধ্বে যার প্রভাব। পনেরোশ শতাব্দীতে আফানাসেই নিকিতিন (Afanasei Nikitin) তিভের (Tver) থেকে প্রথম ভারতে এসেছিলেন এবং দুই দেশের সংযোগ ঘটিয়েছিলেন। পরে আঠারো শতাব্দীতের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ভারত থেকে রাশিয়া সফর করেন এবং অস্ত্রাখানে শিবির করেন। ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতির (Indology) ও বাংলা থিয়েটারের অন্যতম পথিকৃৎ গেরাসিম লেবাদেব'ও (Gerasim Lebedev) একইসময়ে ভারতে এসেছিলেন। ওনার পর উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ভান মেনাইয়েভ (Ivan Menayev) এসেছিলেন ভারতে। তিনিই পরবর্তী সময়ে রাশিয়ানদের সংস্কৃত শিখিয়েছিলেন। এছাড়াও বৈদিক শিক্ষা, বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি অশোকার উপরও পড়াশোনা ছিল তাঁর। সার্জেই ওল্ডেনবার্গ ও ফাইওডোর স্কেরব্যাটসকোয়-এর মতো পণ্ডিতরা পরবর্তীতে এই ধারা বজায় রেখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এবং আমাদের জাতীর জনক মহাত্মা গান্ধী এবং লিও টলস্টয়ের মধ্যে পত্রালাপ হয়। ভারতের জন্য নিকোলাই রোএরিচের ভালোবাসা আজও আমাদের সংস্কৃতির অংশ। ডসটোভস্কি, পুশকিন ও চেকভ-এর মতো রাশিয়ান সাহিত্যিকদের প্রভাব ভারতীয় নাটক, ছবি, গান ও নাচে প্রত্যক্ষ করা যায়।

ভারতের শিল্প উৎপাদনে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবদান অনস্বীকার্য। বোকারো ও ভিলাইতে কারখানা, ভাকরা-নঙ্গল-এ হাইড্রো ইলেক্ট্রিক ড্যাম এবং রাশিয়ান সোইউজ টি-১১'তে ভারতীয় মহাকাশচারী রাকেশ শর্মার ছবি প্রত্যেক ভারতীয়ের মনে জায়গা করে রেখেছে। বিগত সত্তর বছরে ভারত এক বৃহৎ ও বিস্তৃত শিল্প ও প্রযুক্তির ক্ষেত্র তৈরি করেছে। আমরা আজ বিশ্বের দ্রুততম বৃদ্ধি পাওয়া অর্থনীতিগুলির মধ্যে রয়েছি। ভারতের বৃদ্ধির পরিস্থিতি এর থেকে সুঅবস্থানে কোনওদিনও ছিল না। না এর থেকে বেশি আশা কোনওদিনও ছিল। ১৯৯১-এর ঘটনাগুলি থেকে এগিয়ে এসে রাশিয়া বিশ্বে নিজের শক্তি ও প্রভাব বাড়িয়েছে। রাশিয়র অর্থনীতির আধুনিকীকরণ ঘটেছে এবং একটি নতুন প্রজন্ম তা এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ২০০০ সালে ভারত ও রাশিয়া স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপের চুক্তি সই করে। ২০১০ সালে আমরা নিজেদের সম্পর্ককে স্পেশাল ও প্রিভিলেজড স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপে নিয়ে যাই। এই চুক্তিগুলি শুধু শব্দ নয়। দুই দেশের সম্পর্কের ব্লুপ্রিন্ট এগুলি। সামরিক ক্ষেত্রে আমাদের সংযোগ ভারত ও রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অন্যতম স্তম্ভ। আমাদের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে রাশিয়ান প্রযুক্ত অন্যতম ভরসা। সাখলিন ১-এ এবং ভাঙ্কোর ও তাস-ইউরাখের তৈল খনিগুলিতে ভারতীয় বিনিয়োগও

দুই দেশের সম্পর্কের উদাহরণ। পাশাপাশি কুড়ানকুলামে পরমাণু কেন্দ্র এবং ব্রাহ্মস প্রজেক্টও তার পরিচয়। অর্থনীতিতে আমরা উৎপাদন ক্ষেত্রে যৌথ বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়েছি। আন্তর্জাতিক উত্তর-দক্ষিণ পরিবহন করিডরের উন্নয়ন এবং গ্রিন করিডরের সৃষ্টিও এর প্রমাণ। রাশিয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল ক্ষেত্রে ভারতের অবদানও অনেক। তবে শুধু সাফল্যে তুষ্ট হলে চলবে না আমাদের। বরং নতুন দিশা দেখাতে হবে এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে। দুই দেশের বৃহৎ বাজার, রিসোর্স এবং শিল্প ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যৌথ বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। বর্তমানে আমাদের দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা আশার থেকে কম। আমরা তা বৃদ্ধির চেষ্টা করছি। টেলিকম, বিজ্ঞান ও এনার্জি সেক্টরেও নতুন পরিকল্পনার উপর কাজ চালাচ্ছি আমরা। উচ্চতর প্রযুক্তির পরিকল্পনায় বিনিয়োগের জন্য ফান্ড তৈরি করেছি আমরা। রাশিয়া ও ভারতের আঞ্চলিক অংশগুলির মধ্যেও যোগাযোগ বৃদ্ধির চেষ্টা করছি আমরা। বিশেষত পূর্ব রাশিয়ার অঞ্চলগুলির সঙ্গে। ইউরেশিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গেও বাণিজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা

চালাচ্ছি আমরা। রেল, আইটি, হিরা, পরিকাঠামোর মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবসা বৃদ্ধির চেষ্টা চালাচ্ছি আমরা। দুই দেশের বিজ্ঞানী, বিশ্ববিদ্যালয় ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও সংযোগ বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে। মেক ইন ইন্ডিয়া, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, স্কিল ইন্ডিয়া এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মতো উদ্যোগগুলিতে সামিল হওয়ার জন্য রুশ কম্পানিগুলিকে আহ্বান জানাচ্ছি।আমাদের সম্পর্ক শুধু দ্বিপাক্ষিক নয়। এটি সাধারণ এবং বরাবরই এমন ছিল। আমাদের পার্টনারশিপের বিশ্ব শান্তি ও সুরক্ষায় নিজস্ব অবদান রয়েছে। আমরা বরাবর একে অপরের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে পাশে থেকেছি। আন্তর্জাতিক রাজনীতি, নিরাপত্তা, অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমরা গুরুত্বপূর্ণ দুই দেশ। রাষ্ট্রপুঞ্জ, ব্রিকস, জি-২০, ইস্ট এশিয়া সামিট, আরআইসি এবং আইএইএ-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ফোরামের সদস্য আমরা। শাংঘাই কোঅপারেশন অর্গানইজেশন-এর পূর্ণ সদস্য হওয়ার ইচ্ছা ভারতের রয়েছে। যা রাশিয়ার সমর্থনের মধ্যে দিয়েই সম্ভব।

বিশ্বজুড়ে বহু প্রতিকূলতা সময়ে আমাদের পার্টনারশিপের গুরুত্ব অনেক। বিশ্বের তথাকথিত ক্ষমতাশালী অংশ ধীরে ধীরে রাশ হারাচ্ছে। ক্ষমতার নতুন কেন্দ্রগুলির আর্বিভাব ঘটছে। এই বিষয়গুলি রাষ্ট্রপুঞ্জের নজরেও থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদেরও সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। অধুনা বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল সন্ত্রাসবাদ। যা আগের থেকে অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারী। সন্ত্রাসবাদ আমাদের নিত্য জীবনকে চ্যালেঞ্জ করছে। কিন্তু, সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় ভারত ও রাশিয়া যৌথভাবে লড়াই করছে এবং করবে।

১৯৪৭ থেকে প্রত্যেক ভারতীয় সরকারই রাশিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে। আমার সরকারও এই নীতিতেই বিশ্বাসী এবং একে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। ২০০১ সালে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে আমি প্রথম রাশিয়া এসেছিলাম। সে সফর আমি কোনওদিনও ভুলতে পারব না। রাশিয়ার সাফল্য দেখে আমি বিস্মিত হয়ে যাই। দেশের ইতিহাস নিয়ে নাগরিকদের গর্বও লক্ষ্য করার মতো। এরপরও আমি বেশ কয়েকবার রাশিয়া এসেছি এবং প্রত্যক্ষ করেছি ভারত ও ভারতীয়দের প্রতি এখানকার মানুষের ভালোবাসা। এদেশের নেতৃত্বের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ এবং প্রেসিডেন্ট পুতিনের কাছে বিশেষভাবে। ২০১৬ সালের অক্টোবরে ১৭তম দ্বিপাক্ষিক সামিটে যখন প্রেসিডেন্ট পুতিন গোয়া এসেছিলেন, আমরা দ্বিপাক্ষক সম্পর্ক উদযাপনের রোডম্যাপ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমি সন্তুষ্ট যে সেই রোডম্যাপ সঠিক দিশাতেই যাচ্ছে। এবং নতুন নতুন অনেক উপকরণ এতে যোগ হচ্ছে।দুটি দেশের মধ্যে এমন অন্যন্য় সম্পর্ক স্থাপনের পিছনে প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিচিত ও অপরিচিতকে আমি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই। তাঁদের করে যাওয়া কাজের সুফল আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। বিশ্বের ইতিবাচক পরিবর্তনের স্বার্থে এই সম্পর্ক সবসময়ই এগিয়ে চলবে।

১৮তম ভারত-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক সামিট এবং ইন্টারন্যাশনাল ইকনোমিক ফোরাম উপলক্ষে সেন্ট পিটার্সবার্গের মতো সুন্দর শহরে পৌঁছতে এবং প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের জন্য আমি অপেক্ষায় রয়েছি।

ভারত ও রাশিয়ার বন্ধুত্ব দীর্ঘজীবী হোক!

ভারত—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক

ভারত—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক, ভারত ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বোঝায়, ভারতীয়-আমেরিকান সম্পর্ক বা ইন্দো-আমেরিকান সম্পর্ক হিসাবেও পরিচিত।ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতাদের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, যা ১৯৪৭ সালে যুক্তরাজ্য থেকে স্বাধীনতার পরেও অব্যাহত ছিল। ১৯৫৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে একটি কেন্দ্রীয় চুক্তি সংস্থার (সেন্টো) চুক্তি-সহযোগী করে তোলে। পাকিস্তান-আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের

বিরুদ্ধে লড়াই করতে ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে কৌশলগত ও সামরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। ১৯৬১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শীতল যুদ্ধে শক্তি প্রদর্শনের খেলায় জড়িত থাকা থেকে দূরে থাকার জন্য ভারত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হয়ে ওঠে। ১৯৭১-এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় নিক্সন প্রশাসনের পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন করে, যা ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়া পর্যন্ত দুই রাষ্ট্রের সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলে। ১৯৯০-এর দশকে, একতরফা বিশ্বে ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি অভিযোজিত হয় এবং আমেরিকার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে।

একবিংশ শতাব্দীতে, ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে সার্বভৌম অধিকার রক্ষার জন্য এবং বহু-মেরু বিশ্বে জাতীয় স্বার্থ প্রচারের লক্ষ্যে ভারতের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ চাওয়া হয়। রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ. বুশ এবং বারাক ওবামার প্রশাসনের অধীনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভারতের মূল জাতীয় স্বার্থের জন্য স্থানসঙ্কলান প্রদর্শন করে এবং অসামান্য উদ্বেগ স্বীকার করে।

দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বৈশ্বিক সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে সহযোগিতা, বৈশ্বিক প্রশাসনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভারতের অন্তর্ভুক্তি (জাতিসংঘ সুরক্ষা কাউন্সিল), বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ফোরামে উন্নীত প্রতিনিধিত্ব (বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এপেক), বহুপাক্ষিক রফতানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাতে (এমটিসিআর, ওয়াসেনার অ্যারেঞ্জমেন্ট, অস্ট্রেলিয়া গ্রুপ) স্থান এবং পারমাণবিক সরবরাহকারী গ্রুপে সদস্যতার জন্য সহায়তা ও প্রযুক্তি ভাগ করে নেওয়ার ব্যবস্থা মাধ্যমে যৌথ-উৎপাদন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ হওয়ার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক এবং এক গতি ও অগ্রগতির পরিমাপ হয়ে উঠেছে। ২০১৬ সালে, ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লজিস্টিক এক্সচেঞ্জ মেমোরেন্ডাম এগ্রিমেন্টে স্বাক্ষর করে এবং ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান প্রতিরক্ষা অংশীদার হিসাবে ঘোষণা করা হয়।গ্যালাপের বার্ষিক বিশ্ব বিষয়ক (ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স) সমীক্ষা অনুসারে, আমেরিকানরা ভারতকে বিশ্বের ৬ষ্ঠ প্রিয় দেশ হিসাবে বিবেচনা করে, সেইসাথে ২০১৫ সালে ৭১% আমেরিকান ভারতকে অনুকূলভাবে দেখেছে।গ্যালাপ জরিপে দেখা গেছে যে ২০১৪ সালে ৭৪%[১৪] এবং ২০১২ সালে ৭২% আমেরিকান ভারতকে অনুকূলভাবে দেখেছেন।

২০১৭ সালে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য (পণ্য ও পরিষেবাদি উভয় ক্ষেত্রে) ৯.৮% বৃদ্ধি পেয়ে ১২৬,১০,০০,০০,০০০ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রফতানি দাঁড়িয়েছে

$৭৬,৭০০,০০০,০০০ মার্কিন ডলার এবং ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি হয়েছে ৪৯,৪০০,০০০,০০০ মার্কিন ডলার।

গ্রেট ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের ভারতের পাশাপাশি আমেরিকাতেও অঞ্চল ছিল। ১৮৭৮ সালে, যখন আমেরিকাতে ফ্রান্স ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করে, তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ভারতে ফরাসি উপনিবেশগুলিতে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।এটি দ্বিতীয় অ্যাংলো-মাইসোর যুদ্ধের সূচনা করে। মাইসোর রাজ্যের সুলতান হায়দার আলী নিজেকে ফরাসিদের সাথে জোটবদ্ধ করেন এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রাজ্য রক্ষার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সফল হন। ১৭৮০ থেকে ১৭৮৩ সাল অবধি, ফ্রাঙ্কো-মাইসোরিয়ান বাহিনী পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশদের সাথে মাহে ও ম্যাঙ্গালোর'সহ বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ করে।

২৯ শে জুন, উভয় পক্ষ দুর্বল হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ব্রিটিশরা এইচএমএস মেডাকে আত্মসমর্পণের জন্য প্রেরণ করে, মার্কিন স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হওয়ার বিষয়ে ফরাসিদের কাছে চিঠি প্রদান করে। প্যারিস চুক্তিটি কুডলোর অবরোধের কয়েক মাস আগে, ১৭৮২ সালের ৩০ নভেম্বর খসড়া হয়, কিন্তু ভারতে যোগাযোগের বিলম্বের কারণে, সাত মাসের আগে খবর ভারতে পৌঁছায়নি। প্যারিস চুক্তি অবশেষে ৩ সেপ্টেম্বর ১৭৮৩ সালে স্বাক্ষরিত হয় এবং কয়েক মাস পরে মার্কিন কংগ্রেস কর্তৃক এটি অনুমোদিত হয়। চুক্তির শর্তাবলীতে ব্রিটেন পন্ডিচেরিকে ফরাসিদের কাছে ফিরিয়ে দেয় এবং কুডলোর ব্রিটিশরা কাছে ফিরে পায়।

বলা হয় যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পতাকাটি ১৭৭৫ সালের গ্র্যান্ড ইউনিয়ন পতাকা থেকে অনুপ্রাণিত ছিল, শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পতাকাকে অনুপ্রাণিত করে, কারণ উভয় পতাকা একই নকশার ছিল। মাইসোরিয়ান রকেটগুলি বাল্টিমোরের যুদ্ধেও ব্যবহৃত হয় এবং আমেরিকার জাতীয় সংগীত দ্য স্টার-স্পাঙ্গলেড ব্যানারে উল্লেখ করা হয়েছে: এবং রকেটের লাল ঝলক, বোমাগুলি বাতাসে ফেটে যাচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চারটি "ফাউন্ডেশনাল" চুক্তি রয়েছে, যা এটি তার প্রতিরক্ষা অংশীদারদের সাথে স্বাক্ষর করে। পেন্টাগন চুক্তিগুলি "রুটিন যন্ত্র হিসাবে বর্ণনা করে যেগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অংশীদার-দেশগুলির সাথে সামরিক সহযোগিতা প্রচারের জন্য ব্যবহার করে"। আমেরিকান কর্মকর্তারা বলেছেন যে চুক্তিগুলি দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা সহযোগিতার পূর্বশর্ত নয়, তবে একে অপরের দেশগুলিতে বিমান বা জাহাজগুলি

পুনরায় জ্বালানি সরবরাহ করা এবং দুর্যোগ ত্রাণ সরবরাহ করার মতো কার্যক্রম পরিচালনা করা আরও সহজ ও সাশ্রয়ী করে তুলবে। চারটি চুক্তির মধ্যে প্রথমটি, জেনারেল সিকিউরিটি অফ মিলিটারি ইনফরমেশন এগ্রিমেন্ট (জিএসএমআইএ), ২০০২ সালে ভারত ও আমেরিকা স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিটি দুটি দেশের মধ্যে সামরিক বুদ্ধিমত্তাগুলি এবং প্রতিটি দেশকে অন্যের শ্রেণিবদ্ধ সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন তথ্যগুলি ভাগ করে নেওয়ার পক্ষে সক্ষম করে। দ্বিতীয় চুক্তি, লজিস্টিক এক্সচেঞ্জ মেমোরেন্ডাম অফ এগ্রিমেন্ট (এলইএমওএ) ২৯ আগস্ট ২০১৬ এ দুই দেশ স্বাক্ষর করে। এলইএমওএ উভয় দেশের সামরিক বাহিনীকে পুনরায় সরবরাহ বা মেরামত পরিচালনার জন্য অন্যের ঘাঁটি ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। চুক্তিটি উভয় দেশের জন্য লজিস্টিকাল সাপোর্ট বাধ্যতামূলক করে না এবং প্রতিটি অনুরোধের জন্য স্বতন্ত্র ছাড়পত্রের প্রয়োজন হয়। তৃতীয় চুক্তি, যোগাযোগের সামঞ্জস্য ও সুরক্ষা চুক্তি (সিওএমসিএএসএ) সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে উদ্বোধনী ২ + ২ সংলাপের সময় স্বাক্ষরিত হয়। [২২৪ এটি যোগাযোগ ও তথ্য সুরক্ষা মেমোরেন্ডাম অফ এগ্রিমেন্টের (সিআইএসএমওএ) একটি ভারত-নির্দিষ্ট বৈকল্পিক, যা দ্বিপক্ষীয় ও বহুজাতিক প্রশিক্ষণ অনুশীলন এবং পরিচালনার সময় অনুমোদিত দেশগুলিতে নিরাপদ যোগাযোগের বিনিময় ও তথ্যাদি বিনিময় করতে উভয়কে সক্ষম করে। চতুর্থ চুক্তি, বেসিক এক্সচেঞ্জ এবং সহযোগিতা চুক্তি (বিইসিএ) এখনও স্বাক্ষরিত হয়নি। এটি ভারত এবং মার্কিন ন্যাশনাল জিওস্প্যাশিয়াল-ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (এনজিএ) এর মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসিত এবং নিয়ন্ত্রিত অ-শ্রেণিবদ্ধ জিওস্প্যাটিয়াল পণ্য, টোগোগ্রাফিক, নটিক্যাল এবং অ্যারোনটিকাল তথ্য, পণ্য ও পরিষেবাদির বিনিময়ের অনুমতি দেয়। প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পরিক্কার এলইএমওএ-তে স্বাক্ষর করে বলেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত ভারত বাকি চুক্তিগুলিতে স্বাক্ষর করবে।

কিংস কলেজ লন্ডনের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক হর্ষ ভি প্যান্ট আমেরিকান কৌশলগত পরিকল্পনার প্রতি ভারতের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেছেন: "বৃহত্তর ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এবং শক্তির স্থিতিশীল ভারসাম্য তৈরির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার চাবিকাঠি ভারত। এক সময় সম্পদের সীমাবদ্ধতার জন্য, চীনের আক্রমণাত্মক পরিস্থিতিতে এই অঞ্চলে তার বিচ্যুত বিশ্বাসযোগ্যতা উপার্জনের জন্য ভারতের মতো অংশীদারদের প্রয়োজন। "

ভারতের বৈদেশিক নীতি এবং প্রতিবেশীর সাথে তার সম্পর্ক

বিভিন্ন কারনে বিভিন্ন সময় আমরা ভারত কে গালিগালাজ করি কারনে বা অকারনে | তাদের বিভিন্ন বৈদেশিক নীতি এমনকি অনেক সময় তাদের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ নিয়ম নীতি নানা রকম সমলোচনার সম্মুখীন হয় | যেমন কয়েক দিন আগে পরকীয়াকে বৈধতা দেওয়া একটা আইন তোপের মুখে পরেছে | তেমনি বিভিন্ন সময় তাদের নেওয়া বিভিন্ন বৈদেশিক নীতি সমালোচনার মুখে পড়ে| সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করে মনে হয় তার নিজের প্রতিবেশীরাই | তবে তার প্রতিবেশীরা কি কখনো দেখার চেষ্টা করেছে ভারত কীভাবে তার নীতিগুলোকে দেখে ? কীভাবে সে তার কার্যক্রমগুলোকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করে ?

ভারতের বিশাল আয়তন এর প্রতিবেশীদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করে কারন বৃহৎ প্রতিবেশী কেউ ভালোবাসে না | এটা শুধু ভারত ও তার প্রতিবেশীদের জন্যই প্রযোজ্য তা নয় | এটা অন্যান্য রাষ্ট্র গুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেউ বোধহয় মেক্সিকোর মানুষজনকে জিজ্ঞেস করলেই হবে সে আমেরিকাকে কীভাবে দেখে আবার ইউক্রেন কে জিজ্ঞেস করলেও হবে সে রাশিয়াকে নিয়ে কী ভাবে এবং দুই ক্ষেত্রেই যেটা জানা যাবে সেটা হলো বৃহৎ প্রতিবেশীর পাশে থাকা আসলেই মনে আশংকার সৃষ্টি করে।

তবে তাদের এই যুক্তি যে ভ্রান্ত এতো সহজেই অনুমেয় | কারন বৃহৎ প্রতিবেশী হয়ে চীন তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র গুলোর সাথে যেভাবে সম্পর্ক রক্ষা করছে আসলে তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার এবং এই জায়গাটাতে বলা যায় ভারত ব্যর্থ হয়েছে | প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ২০১১ সালে বাংলাদেশ সফরে বলেছিল ভারতের নিয়তি তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র গুলোর সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা তাই যতদিন পর্যন্ত ভারত এটা উপলব্ধি না করবে ততদিন ভারতের ভাগ্যের কোন উন্নতি হবে না |

প্রতিবেশী এই রাষ্ট্র গুলোর ক্ষেত্রে প্রায় সময়ই দেখা যায় তারা ভারত দিয়ে আবদ্ধ অথাৎ তাদের একমাত্র প্রতিবেশী শুধু ভারত তাই এই সব রাষ্ট্র গুলোর চাওয়া পাওয়া সব সময়ই ভারতের কাছে বেশি থাকে এবং একই সাথে একটা ভীতিও থাকে তারা ভারত দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত হচ্ছে না তো | দিনের পর দিন আরেকটা ভারত হয়ে যাচ্ছে না তো তাদের দেশ | তাই ভারতের প্রতিবেশী দের প্রথম চেষ্টাই থাকে কীভাবে নিজেকে অভারতীয় প্রমান করা যাবে | কীভাবে ভারতের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে নিজেদের পরিচয় রক্ষা করা যাবে |

তবে উপমহাদেশ স্বাধীনতার পর থেকে এখন পযর্ন্ত বেশ ভালো রকমের উন্নতি হয়েছে তা বলা যায় নেপালের গৃহযুদ্ধ বন্ধ হয়েছে এবং নেপাল কোয়ালিশন সরকার গঠনে সমর্থ হয়েছে। ভুটানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়েছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আদলে নির্বাচনও হচ্ছে। সাংবাধানিক রাজতন্ত্র সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশে সেনা শাসিত সরকার ব্যবস্থা থেকে সিভিলিয়ান শাসিত সরকার ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে।

শ্রীলংকাতে শ্রীলংকান বাহিনীর হাতে তামিল টাইগাররা পরাজিত হয়েছে এবং ক্রমাগত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হচ্ছে | ২০১২ সালে মালদ্বীপে একটা রক্তপাত ছাড়া অভ্যুত্থান হয়েছে আর এতে ক্ষমতা প্রেসিডেন্ট থেকে ভাইস প্রেসিডেন্টের কাছে হস্তান্তর হয়েছে | এমনকি মায়ানমারও কিছু নির্বাচন করেছে যদিও এসব নির্বাচনের বেশিরভাগই বির্তকিত | উপরের উদাহরণগুলো থেকে বুঝা যায় ধীরে ধীরে দক্ষিন এশিয়া শান্তি, সমৃদ্ধি এবং উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তির সুবাতাস বইলেও ভারতের সাথে এবং ভারতের কারণেই বোধ হয় বেশ কিছু অশান্তির যেন অবসান ঘটছেই না|

ভারতের তার প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে প্রধান কিছু সমস্যা আছে যা সম্পর্ক উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে। যেমন ভারত প্রায় সময়ই নেপালের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে যা নেপালের জন্য মেনে নেওয়া কঠিন | তেমনি বাংলাদেশের সাথে সমস্যা তখন থেকে শুরু হয় যখন থেকে ভারতের বর্ডার গার্ড নিরাপরাধ বাংলাদেশীদের সীমান্তে হত্যা করতে থাকে |

পাকিস্তানের সাথে ভারতের সম্পর্ক সেই ১৯৪৭ সালের পর থেকেই টানাপোড়নের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে । কাশ্মীর ইস্যু দুই দেশের মধ্যে তো এখনও বিবাদের অপর নাম এবং এই ইস্যুটার অদৌ কোন সমাধান হবে বলে জানাও যায় না । তাই দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক অদূর ভবিষ্যতে অদৌ ঠিক হবে কিনা এখনই বলা যাচ্ছে না । এছাড়াও ভারতের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক কি হবে তা অনেক সময় আমেরিকা এবং চীন ঠিক করে দেয় অথাৎ এই দুটি দেশ ভারত পাকিস্তান সম্পর্কে বড় ধরনের প্রভাব রাখে ।

গত কয়েক শতাব্দীতে দক্ষিন এশিয়ার অনেক উন্নতি হয়েছে একথা বলাই যায় । শুধু অথর্নৈতিক উন্নতি নয় দক্ষিণ এশিয়ার সামাজিক , রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও চরম উন্নতি হয়েছে । তবে কিছু প্রতিবন্ধকতা তো রয়েই গেছে যেমন ক্ষুধা, দারিদ্র্য , অর্থনৈতিক মন্দা দক্ষিণ এশিয়াকে এখনও ছেড়ে যায় নি । তাই এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বৈদেশিক নীতি এর প্রতিবেশী দেশগুলোর জন্য খুবই গূরত্বপূর্ণ কারন ভারতের বৈদেশিক নীতির দ্বারা এসব দেশের অভ্যন্তরীণ নিয়ম নীতিও অনেক প্রভাবিত হয় ।

যদিও চীন তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র গুলোর সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখে আসছে তবে এখনকার সময়ে দেখা যায় যে দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে চীন আর তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র গুলোর মধ্যে এক ধরনের টানা পোড়নের সৃষ্টি হয়েছে । যখন এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তখন ভারতের দরকার ছিলো কার্যকরী এবং শক্তিশালী সিদ্ধান্ত গ্রহন করা আর ভারত ঠিক এই জায়গাটিতে তার প্রতিবেশীদের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে ।

১৯৯৬ সালে গুজরাল চুক্তি বা নীতিমালা ভারতের জন্য ছিলো একটা ভালো এবং কার্যকরী পদক্ষেপ এ কথা তো জোর দিয়েই বলা যায় । গুজরাল চুক্তির মূল কথাই ছিলো কীভাবে প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক কে সমৃদ্ধি এবং শান্তির পথে নেওয়া যায় । গুজরাল নীতিমালার পর থেকেই মূলত ভারত পদক্ষেপ নেয় তার প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের শপথ নেয় এবং সেই পথে ভারত কতটুকু এগিয়েছে তা বলা এখনই মুশকিল । তবে ভারত এখনো যে দাদাগিরির নীতি নিয়ে চলছে তাতে এ পথে যে অনেকদূর হাঁটতে হবে সে কথা হলফ করেই বলা যায় ।

ভারতের নতুন বৈদেশিক নীতি হল Common vision for all আর ভারত তার এই ধারনাটি পুরো উপমহাদেশে প্রচার করতে চায় । ভারত শুধু তার স্থিতিশীল বন্ধুরাষ্ট্র গুলোকে নিয়ে ভাবে তা নয় ভারত তার অস্থিতিশীল রাষ্ট্রগুলোকে নিয়েও ভাবে যেমন আফগানিস্তান । ভারত মনে করে আফগানিস্তানে শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব আর আফগানিস্তান হতে পারে তার পরর্বতী এবং উপমহাদেশের অন্যতম বানিজ্য অঞ্চল কারন প্রাচীনকাল থেকে আফগানিস্তান ছিলো একটা সমৃদ্ধ বানিজ্য অঞ্চল। আফগানিস্তানে ইতিমধ্যে আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহার শুরু হয়েছে এখন দেখার বিষয় হলো আফগানিস্তানে আমেরিকান সেনা প্রত্যাহারের পর এর অবস্থা কি হয় ।

ভারত মনে করে তার উত্থান অন্য কোন রাষ্ট্রের জন্য বিশেষ করে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র গুলোর জন্য কখনই হুমকির কারন হতে পারে না । ভারত মনে করে তার রয়েছে অধিকার শান্তিপূর্ন রসমৃদ্ধির । তবে ভারতকে শান্তিপূর্ন সমৃদ্ধির জন্য যা করতে হবে তাহলো অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্ররাষ্ট্রগুলোকেও সমৃদ্ধির সুযোগ দিতে হবে । সমসাময়িক অবস্থা বিবেচনা করে তাই বলা যায় সার্ক বর্তমান সময়ে বেশি মনোযোগ দাবি করে Non Alignment Movement বা জোটবিরোধী আন্দোলনের থেকে এবং বাংলাদেশ ,নেপাল, ভুটানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন বেশি জরুরী ভারতের জন্য ভারত – আমেরিকা পারমাণবিক চুক্তির থেকে কারন আগে ঘর তবে তো পর ।

ভারতের জন্য মনে হয় সবচেয়ে বেশি কার্যকর এবং যৌক্তিক সিদ্ধান্ত হবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের দিকে না গিয়ে বহুপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা কারণ ছোট রাষ্ট্র গুলো সব সময়ই বড় রাষ্ট্রগুলোকে সন্দেহের চোখে

দেখে এবং মনে করে দ্বি পাক্ষিক বাণিজ্যে তাদের ক্ষতি হবে। বড় রাষ্ট্র তাকে শোষণ করবে।ভারতের নেওয়া Look East policy একটি কাযর্কর পদ্ধতি হতে পারে এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর সাথে ভারতের সম্পর্কের মান বৃদ্ধির জন্য।

ভারত নিজেকে ইতিমধ্যে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে কিন্ত গ্লোবাল পাওয়ার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার সাথে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রেগুলোর সহযোগিতা প্রয়োজন বিশেষ করে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতা আরো বেশি প্রয়োজন। প্রতিবেশীদের সহযোগিতা ছাড়া বৈশ্বিক রাষ্ট্র হিসেবে আত্নপ্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব এ কথা সহজেই অনুমেয়।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গুরু নানকের একটা উক্তি খুব প্রাসঙ্গিক – গুরু নানক একবার বলেছিলেন উচু গাছের মুখাপেক্ষী না হয়ে তুমি বরং নীচু হও কারণ উচু গাছ হয়তো তোমাকে রেখে চলে যাবে অথবা তার পাতা মলিন হয়ে যাবে কিন্ত ঘাস তো সব সময়ই চির সবুজ থাকবে। তেমনি বলা যায় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বন্ধুত্বের পালাবদল তো হতেই থাকে কিন্ত প্রতিবেশী ছোট অথবা বড় হোক সব সময় প্রতিবেশীই থাকে।

*তথ্যসূত্রঃ উইকিপিডিয়া